নজরুলের প্রবন্ধ : সমাজচৈতন্য

সিদ্দিকা মাহমুদা

বিশুদ্ধ নান্দনিক প্রযত্নে নয়, নজরুল প্রবন্ধ লিখেছেন প্রধানত দেশকাল পরিবেশ ও কর্মজগতের প্রণোদনায়। পরাধীন দেশের যন্ত্রণা, স্বসমাজ ও প্রতিবেশী হিন্দু সমাজের পারস্পরিক সহাবস্থান সত্ত্বেও উপজাত সমস্যা-সংঘাত, ধনবান-ধনহীনের বৈষম্য, অশিক্ষা-কুসংস্কারের প্রবল পীড়ন এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁর সত্যসন্ধ স্পর্শকাতর হৃদয়ে যে তীব্র আলোড়ন তুলেছিল প্রবন্ধসমূহে তার স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগময় বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। এ সমস্ত প্রবন্ধের অধিকাংশ সম্পাদকীয় তাগিদে লেখা, কিছু কিছু আবার বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত অভিভাষণ আকারে প্রাপ্ত, ফলত সুপরিকল্পিত প্রবন্ধের প্রস্তুতি ও পরিশীলন এখানে পাওয়া যায় না। তথাপি অবশ্যম্ভাবী রূপে তা স্বদেশ ও স্বকালস্পর্শী।

১৯১৯ সালে নজরুল যখন দেশে ফিরেছেন তখন চারদিকে পুঞ্জীভূত গণবিক্ষোভের প্রলয়-মেঘ। সন্ত্রাসবাদ কিছুটা স্তিমিত হলেও ১৯২০-এর সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের বিশেষ কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত হয়েছে গান্ধীর অসহযোগ প্রস্তাব। পাশাপাশি সূচিত খিলাফত আন্দোলন। আর এই বছরই সান্ধ্যদৈনিক *নবযুগে* (১৯২০) নজরুল লিখে চলেছেন অগ্নিগর্ভ সম্পাদকীয় নিবন্ধ, যার কিয়দংশ নিয়ে *যুগবাণী*-র গ্রন্থনা। ১৯২২ এর ২৬শে অক্টোবর নজরুলের প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ *যুগবাণী*-র আত্মপ্রকাশ আর মাত্র তিনমাসের মধ্যেই তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার কর্তৃক তা বাজেয়াপ্তকরণ। *যুগবাণী*-র প্রথম প্রবন্ধ 'নবযুগ'-এ বিশ্বব্যাপী গণজাগরণ সম্পর্কে নজরুলের সচেতনতা লক্ষণীয়। রুশ বিপ্লব, আইরিশ স্বাধীনতা সংগ্রাম, নব্যতুর্কী আন্দোলন ইত্যাদি, সামন্তবাদ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈশ্বিক বিদ্রোহ-বিপ্লবের তরঙ্গাভিঘাতে আন্দোলিত নজরুল দেখেছেন পরাধীন ভারতবর্ষের মুক্তিস্বপ্ন--

> আজ রক্ত-প্রভাতে দাঁড়াইয়া মানব নব প্রভাতী ধরিয়াছে--"পোহাল পোহাল বিভাবরী, পূর্ব তোরণে শুনি বাঁশরি!" এ সুর নবযুগের। সেই সর্বনাশা বাঁশির সুর রুশিয়া শুনিয়াছে, আয়ার্ল্যান্ড শুনিয়াছে, তুর্ক শুনিয়াছে, আরো অনেকে শুনিয়াছে এবং সেই সঙ্গে শুনিয়াছে আমাদের হিন্দুস্থান,--জর্জরিত, নিপীড়িত, শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ।[১]

জালিয়ানওয়ালাবাগের নির্মম হত্যাকাণ্ডের মহানায়ক জেনারেল ডায়ার হয়েছেন আক্রান্ত। ক্ষরিত হয়েছে তীব্র শ্লেষ—

> ইহার যে স্মৃতিস্তম্ভ খাড়া করা হইবে, তাহার চূড়া হইবে এত উচ্চ যে ভারতে যে কোন প্রান্তর হইতে তাহা যেন স্পষ্ট মূর্ত হইয়া চোখের সামনে জাগিয়া ওঠে। এ-ডায়ারকে ভুলিব না, আমাদের মুমূর্ষু জাতিকে চিরসজাগ রাখিতে যুগে যুগে এমনই জল্লাদ কসাই-এর আবির্ভাব মস্ত বড় মঙ্গলের কথা।[২]

নজরুল প্রশ্ন তুলেছেন 'মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে?' রুদ্র রোষে ঝলসে উঠেছে তাঁর কণ্ঠ—

> তোমাদের একজনকে মারিলে আমাদের এক হাজার লোককে খুন কর, আর আমাদের হাজার লোককে পাঁঠাকাটা করিয়া কাটিলেও তোমাদের কিছু বলিতে পাইব না? মনুষ্যত্বের, বিবেকের, আত্মসম্মানের স্বাধীনতার উপর এত জুলুম কেহ কখনও সহ্য করিতে পারে কি?[৩]

বৃটিশ সরকারের পদলেহনকারী উচ্চপদস্থ নেটিভদের করেছেন বিদ্রূপবিদ্ধ। চাকরি নামক দাসত্বের পরিচর্যা না করে বাঙালিকে তিনি স্বাধীনচিত্ত সাহসী মানুষের ন্যায় মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে অনুপ্রাণিত করেছেন:

> দেখাইতে পার কি, কোন জাতি চাকরি করিয়া বড় হইয়াছে? আমরা দশ-পনর টাকার বিনিময়ে মনুষ্যত্ব, স্বাধীনতা অনায়াসে প্রভুর পায়ে বিকাইয়া দিব, তবু ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত দিব না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিব না। এই জঘন্য দাসত্বই আমাদিগকে এমন ছোট হীন করিয়া তুলিতেছে।[৪]

নজরুলের দ্বিতীয় বাজেয়াপ্তকৃত প্রবন্ধ গ্রন্থ *দুর্দিনের যাত্রী* ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। *যুগবাণী*-র মতই এই গ্রন্থ নজরুল পরিচালিত *ধূমকেতু* (১৯২২) পত্রিকার কতিপয় সম্পাদকীয় নিবন্ধের সমষ্টি। বৃটিশশাসনের বিরুদ্ধে উদ্‌গীর্ণ তীব্রকণ্ঠের হলাহল এখানে অধিকতর ঘনীভূত।

> এস আমার অগ্নি-নাগ-নাগিনীর দল! তোমাদের পলক-হারা রক্ত-চাওয়ার যাদুতে হিংস্র পশুর রক্ত হিম করে ফেলি, তোমাদের বিপুল নিশ্বাসের ভীম আকর্ষণে টেনে আন ঐ পশুগুলোকে আমাদের অগ্নি-অজগরের বিপুল মুখগহ্বরে। আকাশে ছড়াও হলাহল-জ্বালা, নীল আকাশ পাংশু হয়ে উঠুক। রবি-শশী-তারা গ্রহ-উপগ্রহ সব বিষ-দাহনে নিবিড় কাল হয়ে উঠুক, বাতাস খুন-খারাবির রঙে রেঙে উঠুক।[৫]

'আমরা লক্ষ্মীছাড়ার দল', 'মোরা সবাই স্বাধীন : মোরা সবাই রাজা', 'স্বাগত', 'মেয় ভুখা হুঁ', 'আমি সৈনিক' ইত্যাদি রচনায় অলস, অকর্মণ্য, ভীরু, আত্মশক্তি সম্পর্কে অচেতন স্বদেশবাসীকে নবতর আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উন্মাদ তাণ্ডব নৃত্যে প্রলয়-শিঙ্গা বাজিয়ে সব কিছু ধ্বংস করার উন্মাতাল আহবান জানিয়েছেন। এ পথে মায়া-মমতা-করুণার কোন স্থান নেই:

ক. দেশেকে যে নারীর করুণা নিয়ে সেবা করে, সে পুরুষ নয়, হয়ত মহাপুরুষ। কিন্তু দেশ এখন চায়, মহাপুরুষ নয়। দেশ চায়, সেই পুরুষ যার ভালোবাসায় আঘাত আছে, বিদ্রোহ আছে। যে দেশকে ভালোবেসে শুধু চোখের জলই ফেলবে না, সে দরকার হলে আঘাতও করবে, প্রতিঘাতও বুক পেতে নেবে, বিদ্রোহ করবে।[৬]

খ. ছুটাও অশ্ব, চালাও রথ, হানো অগ্নিবাণ, বাজাও দামামা-দুন্দুভি। বল, যে যায় যাক সে, আমি আছি। বল আমিই নূতন করে জগৎ সৃষ্টি করব। স্রষ্টার আসন থরথর ক'রে কেঁপে উঠুক। বল, কারুর অধীনতা মানি না, স্বদেশীরও না, বিদেশীরও না। যে অপমান করে তার চেয়ে কাপুরুষ হীন সে-ই, যে অপমান সয়। তোমার আত্মশক্তি যদি উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে তবে বিশ্বে এত বড় দানব শক্তি নেই যা তোমাকে পায়ের তলায় ফেলে রাখে।[৭]

নজরুল যেন ছিলেন এই উত্তপ্ত বহ্নিমান যুগের নকীব। যুগপৎ কবিতা ও প্রবন্ধে সমগ্র চেতনায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া ভাষার এত তীব্র, অনর্গল, আবেগায়িত উৎসব সমকালীন অন্য কোন কবি বা লেখকের রচনায় দেখা যায় নি। তিনি স্পষ্ট অনুধাবন করেছিলেন রুদ্র ধ্বংসের প্রলয় লীলায় সবকিছু তলিয়ে দিতে না পারলে নব সৃষ্টির বীজ অনঙ্কুরিত থেকে যাবে। পরবর্তী *রুদ্রমঙ্গল* (১৯২৬) গ্রন্থের নামকরণে শুধু নয়, গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহে অনুরূপ চিন্তার সমর্থন সুস্পষ্ট। 'রুদ্র মঙ্গল', 'আমার পথ', 'মোহর্‌রম', বিষ-বাণী', 'ক্ষুদিরামের মা', 'ধূমকেতুর পথ' সর্বত্র প্রবন্ধকার পরানুগ্রহে আত্মতৃপ্তি ও মিথ্যাচারের মোহজাল অপসারিত করে বিদ্রোহ, সংগ্রাম, রক্তক্ষয়ের পথে সকল উৎপীড়নের প্রতিবাদ ঘোষণার জন্য স্বদেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর পর্যালোচনা—

> স্পষ্ট কথা বলায় একটা অবিনয় নিশ্চয় থাকে; কিন্তু তাতে কষ্ট পাওয়াটা দুর্বলতা। নিজকে চিনলে, নিজের সত্যকেই নিজের কর্ণধার মনে জানলে নিজের শক্তির উপর অটুট বিশ্বাস আসে। এই স্বাবলম্বন, এই নিজের ওপর অটুট বিশ্বাস ক'রতেই শিখাচ্ছিলেন মহাত্মা গান্ধীজী। কিন্তু আমরা তার কথা বুঝলাম না, "আমি আছি" এই কথা না বলে সবাই বলতে লাগলাম, "গান্ধীজী আছেন"। এই পরাবলম্বনই আমাদের নিষ্ক্রিয় ক'রে ফেললে। একেই বলে সবচেয়ে বড় দাসত্ব। অন্তরে যাদের এত গোলামির ভাব, তারা বাইরের গোলামি থেকে রেহাই পাবে কি ক'রে?[৮]

তাঁর বক্তব্য অকুণ্ঠ এবং নির্ভয়

> সর্বপ্রথম, "ধূমকেতু" ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ-টরাজ বুঝি না, কেননা, ও-কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ-দেশে মোড়লী ক'রে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদেরে পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুঁটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে।[৯]

'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'[১০], প্রবন্ধে ১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ যে-কথা বলেছিলেন নমনীয় উচ্চারণে, ১৯২২ সালে নজরুলের দ্রোহী কণ্ঠে তা ঋজু ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯২১ সালের ডিসেম্বরের শেষে, অল-ইন্ডিয়া কংগ্রেস ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের আহমদাবাদে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে উর্দু কবি ফজ্‌লুল হাসন হস্‌রৎ মোহানী উর্দু ভাষায় ভরতের পরিপূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। কিন্তু গান্ধী প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেন এবং রাজদ্রোহের অপরাধে মোহানীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নজরুলের বক্তব্য প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> আগে এইভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা কোনো বৈধ কাগজে এইরূপ খোলাখুলিভাবে কেউ বলেছেন বলে আমার জানা নেই। গোপন ইশ্‌তিহারে অনেকেই বলে থাকতে পারেন। অনেক শক্ত বুকের পাটা ছিল বলেই নজরুল এইভাবে খোলাখুলি পরিপূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলতে পেরেছিল, এই বলার জন্যে হস্‌রৎ মোহানীর কঠোর সাজা হওয়া সত্ত্বেও।[১১]

সন্ত্রাসবাদী দলের মুখপত্র হয়ে ওঠা *ধূমকেতু*-র অধিনায়কের এ-সত্য অজানা ছিল না এ পথের যাঁরা যাত্রী তাঁদের মৃত্যু নেই, তাঁরা অবিনশ্বর--

> আমরা অবিনশ্বর। আমাদের একজন যায়, একশ' জন আসে। আমাদের একবিন্দু রক্ত ভূতলে পড়লে একলক্ষ বিদ্রোহী নাগশিশু বসুমতী বিদীর্ণ করে উঠে আসে। আমরা অদম্য। আমাদের একজন বাঁধা পড়লে একশ' জন ছাড়া পায়, সহস্র ভুজগ ছুটে এসে তার স্থান পূর্ণ করে।[১২]

গান্ধী বা তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে প্রাথমিক পর্যায়ে নজরুলের অনাস্থা ছিল না; 'যুগবাণী'-পর্বের বক্তব্যে তা সুপ্রমাণিত। ধর্মঘট, অসহযোগ, সরকারী চাকরি তথা সরকারী সংস্রব বর্জন, জাতীয় বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ ইত্যাদি কর্মসূচীর প্রতি তাঁর সমর্থন লক্ষ করা যায়, অবশ্য অসহযোগের সময় আবেগতাড়িত হয়ে বিদ্যালয় বর্জন তিনি মেনে নিতে পারেন নি। তবে, ১৯২২ সালে গান্ধীর আকস্মিক আন্দোলন বন্ধ ঘোষণা তাঁকেও বিভ্রান্ত করে। অতঃপর 'দারুণ নৈরাশ্য, হতাশা আর বুর্জোয়া নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়া নজরুল চেতনাপ্রবাহে ত্রিবিধ প্রবণতার সৃষ্টি করল: [১] নেতৃত্বের প্রতি অবিশ্বাস, অনাস্থা; [২] সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন এবং [৩] নৈরাজ্যিক অস্থিরতা।'[১৩] *যুগবাণী*-উত্তর *ধূমকেতু*- পর্বের রচনায় এই ত্রিধা-বিভক্ত প্রাবন্ধিক মানসের পরিচয় সুস্পষ্ট। তবে সুনির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক দর্শন নজরুলের পক্ষে দেওয়া সম্ভব না হলেও অত্মপ্রবঞ্চনা থেকে আগাগোড়া নিজেকে মুক্ত রাখার স্বপক্ষে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আত্মশক্তির উদ্বোধনেই নির্দেশ করেছেন আত্মমুক্তির ঠিকানা

> ক. আমি যতটুকু বুঝতে পারি, তার বেশি বুঝবার ভান ক'রে যেন কারুর শ্রদ্ধা বা প্রশংসা পাবার লোভ না করি। তা সে মহাত্মা গান্ধীরই মত হোক আর মহাকবি রবীন্দ্রনাথেরই মত হোক কিংবা ঋষি অরবিন্দেরই মত হোক, আমি সত্যিকার প্রাণ থেকে যেটুকু সাড়া পাই রবীন্দ্র, অরবিন্দ বা গান্ধীর বাণীর আহ্বান ঠিক ততটুকু মানবো। তাঁদের বাণীর আহ্বান যদি আমার প্রাণে প্রতিধ্বনি না তোলে, তবে তাঁদের মানব না।[১৪]

খ. আত্মাকে চিনলেই আত্মনির্ভরতা আসে। এই আত্মনির্ভরতা যেদিন সত্যি সত্যিই আমাদের আসবে, সেই দিনই আমরা স্বাধীন হব, তার আগে কিছুতেই নয়।[১৫]

কেবল বৃটিশ রাজত্বের উৎপাটনেই নজরুলের আপামর লক্ষ্য নিয়োজিত ছিল না, তাঁর বিদ্রোহ সর্বতোমুখী; সকল প্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অসাম্য, শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদী। এ শুধু রোমান্টিক দ্রোহ নয়, একজন সত্যদর্শী নিরপেক্ষ মুক্তপ্রাণ মানুষের অবিনাশী কণ্ঠ। সমাজে বিরাজমান নানাবিধ বৈষম্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যেমন তিনি স্বীয় সমাজের নানাবিধ সীমাবদ্ধতা যেমন, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন, তেমনি পার্শ্ববর্তী হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ সমস্যাও উপেক্ষা করেন নি। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল দৃঢ়মূল। এই প্রতিবেশী সমাজদ্বয়ের পারস্পরিক বিদ্বেষ তিনি কখনও সমর্থন করেন নি। তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় মনুষ্যত্ববোধ—মানুষকে মানুষ হিসেবেই মূল্য দিতে হবে। হিন্দু সমাজের অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—

> হিন্দু ধর্মের মধ্যে এই ছুঁৎমার্গরূপ কুষ্ঠরোগ যে কখন প্রবেশ করিল তাহা জানি না, কিন্তু ইহা যে আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃদের মত একটা বিরাট জাতির অস্থিমজ্জায় ঘুণ ধরাইয়া একেবারে নির্বীর্য করিয়া তুলিয়াছে, তাহা আমরা ভাইয়ের অধিকারের জোরে জোর করিয়া বলিতে পারি।[১৬]

উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন যে বিরাট শক্তি সম্ভাবিত করতে পারে তার যথাযথ ব্যবহারে নিহিত দেশ ও জাতির সর্বাঙ্গীন কল্যাণ। অথচ মানুষ পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক বলে বৃহদাংশ মানুষকে দূরে সরিয়ে রাখছে; কার্যক্ষেত্রে প্রকৃত ভূমিকা রাখার যোগ্যতা যাদের তাদের উপেক্ষা শক্তির অপচয়ই চিহ্নিত করে। নজরুলের মতে জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সমাজভেদ উপেক্ষা করে মহাত্মা গান্ধী প্রাণের মুক্ত ঔদার্যে দেশসেবার মহান কর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বলেই সর্বসাধারনের গ্রহণীয় এবং বরণীয় হয়েছেন। তিনি লিখেছেন—

ক. যদি পার, এমনি করিয়া ডাক, এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন কর— দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার, তোমার কি অধিকার আছে? ইহা ত আত্মার ধর্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতই ভাস্বর, আর একই মহা-আত্মার অংশ। তোমার জন্মগত অধিকারটাই কি এত বড়? তুমি যদি এই চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার মত ভদ্রলোকদের দেওয়া এই সব হতাদর উপেক্ষার আঘাত, বেদনার নির্মমতা একবার কল্পনা করিয়া দেখ দেখি,-ভাবিতে তোমার আত্মা কি শিহরিয়া উঠিবে না?[১৭]

খ. সমাজ বা জন্ম লইয়া এই যে বিশ্রী উঁচু-নীচু ভাব, তাহা আমাদিগকে জোর করিয়া ভাঙিয়া দিতে হইবে। আমরা মানুষকে বিচার করিব মনুষ্যত্বের দিক দিয়া,

> পুরুষকারের দিক দিয়া। এই বিশ্ব-মানবতার যুগে যিনি এমনই করিয়া দাঁড়াইতে পারিবেন, তাঁহাকে আমরা বুক বাড়াইয়া দিতেছি—তাঁহাকে নমস্কার করি।[১৮]

মুসলমান সমাজে প্রচলিত গোত্র বৈষম্যও ছিল তাঁর কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত:

> দেয়ালের পর দেয়াল তুলে আমরা ভেদ-বিভেদের জিন্দানখানার সৃষ্টি করেছি; কত তার নাম--সিয়া, সুন্নি, শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, হানাফি, শাফি, হাম্বলি, মালেকি, লা-মজহাবি, ওহাবি ও আরও কত শত দল। এই শত দলকে একটি বোঁটায়, একটি মৃণালের বন্ধনে বাঁধতে পার তোমরাই। শতধা-বিচ্ছিন্ন এই শতদলকে এক সামিল করো, এক জামাত করো--সকল ভেদ-বিভেদের প্রাচীর নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে ফেল।[১৯]

স্বসমাজের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার উন্মোচনে তিনি ছিলেন মুক্তকণ্ঠ। ১৯৩২ সালের ৫ ও ৬ই নভেম্বর বঙ্গীয় মুসলমান তরুণ সম্মেলনের সভাপতি হিসেবে সিরাজগঞ্জের শক্রর নাট্যভবনে প্রদত্ত অভিভাষণে নজরুল সমাজে কাঠমোল্লাদের অত্যাচার, অবরোধ প্রথার যন্ত্রণা, স্ত্রীশিক্ষায় অনীহা, তরুণ সম্প্রদায়ের মেরুদণ্ডহীনতা এবং শিল্প সঙ্গীতে শূন্যাবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন—

> মৌলানা মৌলবী সায়েবকে সওয়া যায়, মোল্লাও চক্ষু কর্ণ বুঝিয়া সহিতে পারি, কিন্তু কাঠমোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কওমের জাতির ধর্মের কি অনিষ্ট করিতেছেন তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান নাই বলিয়াই ইঁহাদের ক্ষমা করা যায়।[২০]

তাঁর অভিমত—

> পৃথিবীর আর সব দেশের মুসলমানদের কাছে আরো আমরা অন্ততঃ পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি।[২১]

'মোল্লাতন্ত্র'কে তিনি 'বিন্ধ্যাচল' আখ্যা দিয়েছেন এবং অবরোধ প্রথাকে বিবেচনা করেছেন "হিমাচলের-ন্যায় অলঙ্ঘ্য-।[২২] অজ্ঞতা ও কুসংস্কারপুষ্ট সমাজের মুক্তি নির্দেশনায় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ও কাজী নজরুল ইসলামের চিন্তাচেতনায় সাযুজ্য লক্ষ করা যায়। মুসলমান সমাজের পর্দাপ্রথা সম্পর্কে নজরুলের বক্তব্য--

> আমাদের দুয়ারের সামনের এই ছেঁড়া চট যে কবে উঠিবে খোদা জানেন। আমাদের বাঙলা দেশের স্বল্প শিক্ষিত মুসলমানদের যে অবরোধ, তাহাকে অবরোধ বলিলে অন্যায় হইবে, তাহাকে একেবারে শ্বাস-রোধ বলা যাইতে পারে। এই জুজু-বুড়ির বালাই শুধু পুরুষদের নয়, মেয়েদেরও যেভাবে পাইয়া বসিয়াছে, তাহাতে ইহাকে তাড়াইতে বহু সরিষা-পোড়া ও ধোঁয়ার দরকার হইবে। আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত বা অর্ধ-শিক্ষিত লোকই চাকুরে, কাজেই খরচের সঙ্গে জমার অঙ্ক তাল সামলাইয়া চলিতে পারে না। অথচ ইহাদেরই পর্দার ফখর সর্বাপেক্ষা বেশি। আর ইহাদের বাড়িতে শতকরা আশিজন মেয়ে যক্ষ্মায় ভুগিয়া মরিতেছে আলো বায়ুর

> অভাবে। এই সব যক্ষ্মারোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্য-সুন্দর প্রতিভা-দীপ্ত বীর সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া! ফাঁসির কয়েদিরও এইসব হতভাগিনীদের অপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা আছে।[২৩]

দেশ ও জাতির পূর্ণাঙ্গ বিকাশের স্বার্থে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সে কী বিপুল এ-প্রসঙ্গে তাঁর বেদনাঘন মন্তব্য—

> কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তাহা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চির-বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহ-মন এমনি পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ কিসের যে অভাব তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করি, অথচ জানি না—সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে—নারী।[২৪]

নজরুল লক্ষ করেছেন মুসলমান তরুণ সম্প্রদায় 'যূথভ্রষ্ট', সাধনা, ত্যাগ ও সংঘবদ্ধতার অভাবে তাদের সিদ্ধি অনর্জিত। তারা লেখাপড়া করছে জ্ঞানার্জনের জন্য নয়, সাবরেজিস্ট্রার বা দারোগার ন্যায় পদের মোহাজালে আবদ্ধ হওয়ার জন্য। তিনি আক্ষেপ করে লিখেছেন—

> আজ বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে, একজনও চিত্র-শিল্পী নাই, ভাস্কর নাই, সঙ্গীতজ্ঞ নাই, বৈজ্ঞানিক নাই, ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি আছে? এই সবে যাহারা জন্মগত প্রেরণা লইয়া আসিয়াছিল, আমাদের গোঁড়া সমাজ তাহাদের টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলিয়াছে ও ফেলিতেছে।[২৫]

১৩৩৪ সালের পৌষ সংখ্যা *সওগাত*-এ অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁকে লিখিত নজরুলের যে পত্রখানি প্রকাশিত হয় সেখানে তিনি বাঙালি মুসলমান সমাজের মানসিক দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করছেন। তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত 'কাফের' খেতাবের শিরোপা তাই তাঁকে বিচলিত করে নি; কারণ তিনি জেনেছিলেন 'বাংলার অশিক্ষিত মুসলমানরা গোঁড়া এবং শিক্ষিত মুসলমানরা ঈর্ষাপরায়ণ।'[২৬] তাঁর মতে এই সমাজ 'পতিত Demoralized' হতে পারে, কিন্তু 'দয়ার পাত্র' কখনও নয়। 'এ-সমাজ সর্বদাই আছে দাবি উচিয়ে; এর দোষ-ত্রুটির আলোচনা করতে গেলে নিজের মাথা নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে হয়।'[২৭] এই পচনশীল সমাজের নিরাময়ের জন্য অপরিহার্য 'অস্ত্রচিকিৎসা':

> ফোঁড়া যখন পেকে পচে ওঠে তখন রোগী সবচেয়ে ভয় করে অস্ত্র চিকিৎসককে। হাতুড়ে ডাক্তার হয়ত তখনো আশ্বাস দিতে পারে যে, সে হাত বুলিয়ে ঐ গলিত ঘা সারিয়ে দেবে এবং তা শুনে রোগীরও খুশি হয়ে উঠবার কথা। কিন্তু বেচারি 'অবিশ্বাসী' অস্ত্র চিকিৎসক তা বিশ্বাস করে না। সে বেশ করে তার ধারালো ছুরি চালায় সে-ঘায়ে; রোগী চেঁচায়, হাত পা ছোঁড়ে, গালি দেয়। সার্জন তার কর্তব্য

করে যায়। করণ সে জানে, আজ রোগী গালি দিচ্ছে, দু'দিন পরে ঘা সেরে গেলে সে নিজে গিয়ে তার বন্দনা করে আসবে। ... ...
সমাজ তো হাত-পা ছুঁড়বেই, গালিও দেবে; তা সইবার মত শক্ত চামড়া যাঁদের নেই, তাঁদের দিয়ে সমাজ-সেবা হয়ত চলবে না। এই জন্যই আমি বারেবারে ডাক দিয়ে ফিরছি নির্ভীক তরুণ ব্রতীদলকে। এ-সংস্কার সম্ভব হবে শুধু তাদের দিয়েই।[২৮]

অশিক্ষা অজ্ঞতা, জড়তা, জীর্ণতায় স্থবির—এই 'কুম্ভকর্ণ-মার্কা সমাজকে' জাগানোর জন্য 'আঘাত' হানার প্রয়োজনে নজরুল 'একদল প্রগতিশীল বিদ্রোহীর উদ্ভব' কামনা করেছেন।[২৯] নবসৃষ্টির প্রয়োজনে তিনি সমর্থন করেছেন বৈনাশিকতা; কেবল ভাঙার জন্যই ভাঙার গান তিনি রচনা করেন নি। রোমান্টিক স্বপ্নময়তা তাঁকে নতুন পৃথিবরি স্বপ্নদর্শী করেছিল:

ক. আমিও মানি, গড়ে তুলতে হলে একটা শৃঙ্খলার দরকার। কিন্তু ভাঙার কোনো শৃঙ্খলা বা সাবধানতার প্রয়োজন আছে মনে করিনে। নূতন করে গড়তে চাই বলেই ত ভাঙি--শুধু ভাঙার জন্যই ভাঙার গান আমার নয়। আজ ঐ নূতন করে গড়ার আশাতেই ত যত শীঘ্র পারি ভাঙি—আঘাতের পর নির্মম আঘাত হেনে পচা পুরাতনকে পতিত করি।[৩০]

খ. ভাঙাগড়া কোনটাই অপরটিকে বাদ দিয়ে হতে পারে না, যে গড়তে যাচ্ছে সে যদি না জানে কতখানি জীর্ণ অকর্মণ্য হয়েছে তবে তার গড়ন কিছুতেই দাঁড়াবে না, তার সাধের ইমারত চোখের পলকে ধসে পড়বে। তাই দেশের সেই সঙ্গে নিজের যাঁরা প্রকৃত মঙ্গল ও আনন্দের আকাঙ্ক্ষা করে থাকেন তাঁদের ভাঙবার বেলায় মনে কোন দুর্বলতার স্থান পেতে পারবে না। যে যে অঙ্গে দুষ্ট ব্যাধির জীর্ণ বাসা হয়েছে তার এক চুলও যদি ভাঙতে বাকি থাকে তবে আর রক্ষা নাই। আজ দেখতে পাচ্ছি ভারতের রাষ্ট্রে, সমাজে, ধর্মে প্রায় ষোল আনা ঘুণ ধরে গেছে। আজ প্রলয়ের দেবতা ধ্বংসের নেশায় যতই মত্ত হন ততই মঙ্গল।[৩১]

একই বক্তব্য প্রতিধ্বনিত সিরাজগঞ্জে ১৯৩২ সালে প্রদত্ত অভিভাষণে—

পথ-পার্শ্বের যে অট্টালিকা আজ পড় পড় হইয়াছে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেওয়াই আমাদের ধর্ম; ঐ জীর্ণ অট্টালিকা চাপা পড়িয়া বহু মানবের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে। যে ঘর আমাদের আশ্রয় দান করিয়াছে তাহা যদি সংস্কারাতীত হইয়া আমাদেরই মাথায় পড়িবার উপক্রম করে, তাহাকে ভাঙ্গিয়া নতুন করিয়া গড়িবার দুঃসাহস আছে একা তরুণেরই।[৩২]

দেশনেতা হওয়ার লোভ তাঁর ছিল না। দেশকে ভালবেসে দেশের মানুষের মঙ্গলকামনায় অধীর এই কবি চারণকবি হয়েছেন, হয়েছেন কবি-কর্মী, নিক্ষিপ্ত হয়েছেন কারাগারে।

ক. আমি দেশকর্মী—দেশনেতা নই, যদিও দেশের প্রতি আমার মমত্ববোধ কোন স্বদেশপ্রেমিকের অপেক্ষা কম নয়। রাজ-লাঞ্ছনা ও ত্যাগ স্বীকারের মাপকাটি দিয়া মাপিলে হয়ত আমি তাঁহাদের কাছে খর্ব pigmy বলিয়া অনুমিত হইব। তবু

> দেশের জন্য সম্ভব এইটুকু ত্যাগ স্বীকার করিয়াছি যে, দেশের মঙ্গল করিতে না পারিলেও অমঙ্গল-চিন্তা কোনদিন করি নাই, যাঁহারা দেশের কাজ করেন তাঁহাদের পথে প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াই নাই।[৩৩]

> খ. আমার শক্তি স্বল্প, তবু এই আট বছর ধরে আমি দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক-শ্রমিক তরুণদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করেছি—লিখেছি, বলেছি, চারণের মত পথে পথে গান গেয়ে ফিরেছি। অর্থ আমার নাই, কিন্তু সামর্থ্য যেটুকু আছে, তা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত কোনদিন হয়েছি, এ-বদনাম আর যেই দিক, আপনি দেবেন না বোধ হয়।[৩৪]

এমন কি, পুঁথিপোড়ো মুমূর্ষু সমাজের চেতনাসঞ্চারের জন্য স্বীয় কাব্যাদর্শ নমিত করার কথাও তিনি ভেবেছিলেন।

> সত্য সত্যই আমার লেখা দিয়ে যদি আমার মুমূর্ষু সমাজের চেতনা সঞ্চার হয়, তা হলে তার মঙ্গলের জন্য আমি আমার কাব্যের আদর্শকেও না হয় খাটো করতে রাজি আছি।[৩৫]

হিন্দু-মুসলামান মিলন প্রয়াসে নজরুল ছিলেন ঐকান্তিক। সাম্প্রদায়িক ভেদবাষ্প যে দেশ-জাতি-সমাজের জন্য চরম অকল্যাণকর নানা সূত্রে এ-সত্য তিনি সুস্পষ্ট করেছেন। ভারতবর্ষের পরাধীনতার মূলেও রয়েছে সমাজের এই প্রধান শক্তিদ্বয়ের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতির ভাষণে নজরুল এ-বিষয় আলোকপাত করেছেন:

> ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি—শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটও ভাঙছে—তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা। আমরা মুসলমানেরা আমাদেরই প্রতিবেশী হিন্দুর উন্নতি দেখে হিংসা করি, আর হিন্দুরা আমাদের অবগত দেখে আমাদের অশ্রদ্ধা করে। ইংরেজের শাসন সবচেয়ে বড় ক্ষতি করেছে এই যে, তার শিক্ষা-দীক্ষার চমক দিয়ে সে আমাদের এমনিই চমকিত করে রেখেছে যে, আমাদের এই দুই জাতির কেউ কারোর শিক্ষা-দীক্ষা সভ্যতার মহিমার খবর রাখিনে। হিন্দু আমাদের অপরিচ্ছন্ন অশিক্ষিত কৃষাণ-মজুরদের--আর তাদের সংখ্যাই আমাদের জাতের মধ্যে বেশি দেখে মনে করে, মুসলমান মাত্রই এই রকম নোংরা, এমনি মূর্খ, গোঁড়া। হয়ত বা যথা পূর্বং তথা পরং। দরিদ্র মূর্খ কালিমদ্দি মিয়াই তার কাছে অ্যাভারেজ মুসলমানের মাপকাঠি।[৩৬]

নজরুল অনুধাবন করেছিলেন দুটি জাতির পারস্পরিক অপ্রেমের মূল কারণ নিহিত তাদেরই পারস্পরিক শাস্ত্র- সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানবিষয়ক অজ্ঞানতায়। হিন্দু যেমন আরবি, ফার্সি, উর্দু জানে না, তেমনি মুসলমানও 'অনুস্বারের সঙ্গিন ও বিসর্গের কাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে', প্রবেশে অক্ষম।[৩৭] তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাগ্রসর হিন্দু সমাজ মাতৃভাষায় তাদের অনেক কিছুই ইতোমধ্যে অনুবাদ করেছে যার ফলে বাঙলার মুসলমানেরা হিন্দুর কালচার, শাস্ত্র, সভ্যতা প্রভৃতির

সঙ্গে যত পরিচিত, তার শতাংশের একাংশও পরিচিত নয় সে তার নিজের ধর্ম সভ্যতা ইত্যাদির সাথে।'[৩৮] কারণ 'সাধারণ মুসলমান বাঙলাও ভাল করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি। কাজেই ন'মন তেলও আসেনা, রাধাও নাচে না।'[৩৯] নজরুল উভয় জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য-চিন্তা-চেতনার ভাব বিনিময়ে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন, যার ফলে 'next door neighbour' -এর মানসিক দূরত্ব হ্রাস পায়, সাম্প্রদায়িক মত্ততার অবসান ঘটে এবং তৃতীয় শক্তির আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়া যায়। এই উদ্দেশ্যে তিনি চিন্তাশীল মুসলমানদের মাতৃভাষায় সাহিত্য—জ্ঞান-বিজ্ঞান—ইতিহাস অনুবাদে অনুপ্রাণিত করেছেন। ইব্রাহীম খাঁকে লিখিত পত্রে তাঁর মন্তব্য—

> হিন্দু-মুসলমানের পরস্পরের অশ্রদ্ধা দূর করতে না পারলে যে, এ পোড়া দেশের কিছু হবে না, এ আমিও মানি। এবং আমিও জানি যে, একমাত্র সাহিত্যের ভিতর দিয়েই এ-অশ্রদ্ধা দূর হতে পারে।[৪০]

বাংলা সাহিত্য যে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পদ এবং এ সম্পদে অধিকার কারও একার নয়, এ-সত্য

উচ্চারণে তিনি ছিলেন দ্বৈধমুক্ত।

> বাঙলা—সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায় হিন্দুরও তেমনি মুসলানদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে নিত্য প্রচলিত মুসলমানি শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী তাই তাদের এ-সংস্কারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই। অবশ্য এর জন্যে অনেক জায়গায় আমার কাব্যের সৌন্দর্য হানি হয়েছে। তবু আমি জেনে শুনেই তা করেছি।[৪১]

স্বাভাবিকভাবেই সমালোচিত হয়েছেন তিনি।

> কেউ বলেন, আমার বাণী যবন, কেউ বলেন, কাফের। আমি বলি, ও দুটোর কিছুই নয়। আমি মাত্র হিন্দু-মুসলমানকে এক জায়গায় ধরে এন হ্যাণ্ডশেক করাবার চেষ্টা করেছি, গালাগালিকে গলাগলিতে পরিণত করার চেষ্টা করেছি। সে হাতে হাত মিলানো যদি হাতাহাতির চেয়েও অশোভন হয়ে থাকে, তাহলে ওরা আপনি আলাদা হয়ে যাবে, আমার গাঁট-ছড়ার বাঁধন কাটতে তাদের কোনো বেগ পেতে হবে না। কেননা, একজনের হাতে আছে লাঠি আর একজনের আস্তিনে আছে ছুরি।[৪২]

নজরুল বিশ্বাস করেছেন। শিল্পীর কোনো জাত নেই: সকল ধর্ম-সংসার-সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে মহামানবতার মন্ত্রে তাঁর দীক্ষা

> ক. আমি এই দেশে এই সমাজে জন্মেছি বলেই শুধু এই দেশেরই এই সমাজেরই নই। আমি সকল দেশের, সকল মানুষের। সুন্দরের ধ্যান, তাঁর স্তবগানই আমার উপাসনা, আমার ধর্ম। যে কূলে, যে সমাজে, যে ধর্মে, যে দেশেই জন্মগ্রহণ করি, সে আমার দৈব। আমি তাকে ছাড়িয়ে উঠতে পেরেছি বলেই কবি।[৪৩]

খ. হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক, শুধু একবার এই মহাগগনতলের সীমা-হারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া—মানব!—তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি। বল দেখি, "আমার মানুষ ধর্ম।"[৪৪]

১৮৪১ সালের ৫ ও ৬ই এপ্রিল কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতির রজতজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানের সভাপতি-রূপে নজরুল তাঁর জীবনের শেষ অভিভাষণ প্রদান করেন -'যদি আর বাঁশী না বাজে'। এখানেও তিনি হিন্দু মুসলমান দুটি জাতির দ্বন্দ্ব, সমাজে বিদ্যমান অসম অবস্থার দিকে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন—

হিন্দু-মুসলমানে দিন রাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্য, ঋণ, অভাব—অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাংকে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপর মত জমা হয়ে আছে—এই অসাম্য, এই ভেদ জ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম। আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে, অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম—অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম—আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম সুন্দর। আমি যশ চাই না, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাই না, নেতৃত্ব চাই না—তবু আপনারা আদর করে যখন নেতৃত্বের আসনে বসান, তখন অশ্রু সম্বরণ করতে পারি না। তাঁর আদেশ পাইনি, তবু রুদ্র-সুন্দররূপ আবার আপনাদের নিয়ে এই অসুন্দর, এই কুৎসিত অসুরদের সংহার করতে ইচ্ছা করে।[৪৫]

মুসলিমলীগ-বিদ্বেষী হিসেবে নজরুলকে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। কিন্তু লীগ-কংগ্রেসের মুখ চেয়ে তিনি কখনও কিছু করেন নি। পরাধীন দেশে লীগ-কংগ্রেসের পারস্পরিক বিরোধিতা তাঁর কাছে সমর্থনযোগ্য ছিল না।

ক. আমি "লীগ" 'কংগ্রেস" কিছুই জানি না, মানি শুধু সত্যকে, মানি সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বকে, মানি সর্বজনগণের মুক্তিকে। এক দেশের সৈন্যদল অন্যদেশ জয় করতে যায় বরং তাদেরও স্বীকার করি—কিন্তু স্বীকার করি না ভীরুর আস্ফালনকে, জেল কয়েদিদের মারামারিকে। এক খুঁটিতে বাঁধা রামছাগল, এ খুঁটিতে বাঁধা খোদার খাসি, কারুর গলার বাঁধন টুটল না, কেউ খুঁটি মুক্ত হল না, অথচ তারা তাল ঠুকে এ ওঁকে ঘুঁস মারে! দেখে হাসি পায়। [৪৬]

মুসলমান সমাজের জাগরণের জন্য তাঁর প্রয়াস ছিল সর্বাত্মক। বাংলার অর্ধাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও এই পশ্চাদবর্তী হতচেতন সমাজের ম্রিয়মাণ অবস্থান তাঁকে বিশেষভাবে পীড়িত করে এবং সকলপ্রকার ভীরুতা, হীনমন্যতা, পশ্চাৎমুখিতা ও অনৈক্য থেকে তিনি তাদের মুক্ত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালান।

বাঙলার মুসলমান বাঙলার অর্ধেক অঙ্গ। কিন্তু এই অঙ্গ আলস্যে জড়তায় পঙ্গু। এই অঙ্গকে প্রবল না করলে বাঙলা কখনো পূর্ণাঙ্গ হবে না। বাঙলার এই ছত্রভঙ্গ ছিন্নদল মুসলমানদের আবার এক আকাশের ছত্রতলে , এক ঈদগাহের ময়দানে সমবেত করার জন্যই আমি চিরদিন আজান দিয়ে এসেছি।... ...

মুসলমানের জন্য আমার দান কোন নেতার চেয়ে কম নয়; যে-সব মুসলমান যুবক আজ নব জীবনের সাড়া পেয়ে দেশের জাতির কল্যাণের সাহায্য করছে তাদের প্রায়

সকলেই অনুপ্রেরণা পেয়েছে এই ভিক্ষুকের ভিক্ষা ঝুলি থেকে।[৪৭]

তথাকথিত ক্ষমতালোভী, স্বার্থান্ধ, অহংকৃত নেতৃত্ব সম্পর্কে তিনি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ—

> ক. যে দৃষ্টি আপাত-মধুর লভ্যের লোভে তলোয়ারকে করে ঝিঙে চাঁচার বটি, মাটি খোঁড়ার খোন্তা-সে দূরদর্শী দ্রষ্টা নয়। অন্যের মাল পয়মাল করে নিজে ধনী হওয়ার গুপ্ত লোভ তার অন্তরে জটিল সাপের মত ফণা গুটিয়ে আছে। তার মাথায় মণি থাকলেও সে বিষধর ফণী।[৪৮]
>
> খ. যে কোনো আন্দোলনেরই হোক নেতারা যদি পূর্ণ নির্লোভ নিরহঙ্কার ও নির্ভয় না হন, সে-আন্দোলনকে একদিন না একদিন ব্যর্থ হতেই হবে।[৪৯]

ইসলামের প্রকৃত অর্থ নিরূপণে নজরুল ছিলেন সচেষ্টা। তিনি লিখেছেন—

> ইস্‌লামের সত্যকার প্রাণশক্তিঃ গণশক্তি, গণতন্ত্রবাদ, সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব ও সমাজাধিকারবাদ।[৫০]

সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্রবাদের মূল যে ইসলামেই নিহিত ১৯৪০ সালে কোলকাতায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য—সমিতির ঈদ—সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে তিনি তা স্পষ্ট করেন—

> ধনীর দৌলতে, জ্ঞানীর জ্ঞানভাণ্ডারে সকল মানুষের সমান অধিকার রয়েছে। এ নীতি স্বীকার করেই ইসলাম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করতে পেরেছে। আজ জগতের রাজনীতির বিপ্লবী আন্দোলনগুলির যদি ইতিহাস আলোচনা করে দেখা যায় তবে বেশ বুঝা যায় যে, সাম্যবাদ সমাজতন্ত্রবাদের উৎসমূল ইসলামেই নিহিত রয়েছে। আমার ক্ষুধার অন্নে তোমার অধিকার না থাকতে পারে, কিন্তু আমার উদ্বৃত্ত অর্থে তোমার নিশ্চয়ই দাবি আছে-এ শিক্ষাই ইসলামের। জগতের আর কোন ধর্ম এত বড় শিক্ষা মানুষের জন্য নিয়ে আসেনি। ঈদের শিক্ষার ইহাই সত্যিকার অর্থ।[৫১]

নজরুলের সাম্যবাদী চিন্তা-চেতনার মূলে নিঃসন্দেহে ইসলামের ধনবন্টন পদ্ধতি সক্রিয় ছিল। ফরাসি বিপ্লবের অমর মন্ত্র সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার ভাবধারায়ও তিনি উজ্জীবিত হয়েছিলেন। মার্কসীয় তত্ত্বের ব্যাপক অধ্যয়ন না থাকলেও তাকে স্পর্শ করেছিল রাশিয়ার বলশোভিক বিপ্লব, মার্কস-লেনিনের স্বপ্ন। বস্তুত সহজাত বিবেক, কর্তব্য, ন্যায় ও মানুষ্যত্ববোধ দিয়ে এই সংবেদনশীল কবি সবকিছু গ্রহণ ও বিচার করেছিলেন। *যুগবাণী*-তে ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি লিখেছেন—

> চাষী সমস্ত বৎসর ধরিয়া হাড়-ভাঙা মেহনত করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও দু-বেলা পেট ভরিয়া মাড়ভাত খাইতে পায় না; হাঁটুর উপর পর্যন্ত একটা তেনা বা নেঙট ছাড়া তাহার আর ভালো কাপড় পিরান পরা সারা-জীবনেও ঘটিয়া উঠে না, ছেলেমেয়ের সাধ-আরমান মিটাইতে পায় না, অথচ তাহারই ধান-চাল লইয়া মহাজনরা পায়ের উপর পা দিয়া বারমাসে তেত্রিশ পার্বণ করিয়া নওয়াবী চালে দিন

> কাটাইয়া দেন। কয়লার খনির কুলিদিগকে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাদের কেহ ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের বেশি বাঁচে না; তাহারা দিবারাত্রি খনির নিচে পাতালপুরীতে আলো-বাতাস হইতে নিজেদের বঞ্চিত করিয়া কয়লার গাদায় কেরোসিনের ধোঁয়ার মধ্যে কাজ করিয়া শরীর মাটি করিয়া ফেলে। কোম্পানি তো তাহাদেরই দৌলতে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিতেছেন, কিন্তু এ-হতভাগাদের স্বাস্থ্য, আহার প্রভৃতির দিকে ভুলিয়াও চাইবেন না।....
>
> আজকাল বিশ্ব-মানবের মধ্যে Larger humanity বলিয়া যে একটা মহত্তর মানবতার স্বর্গীয় ভাব জাগিয়েছে, এই কল-কারখানার অধিকাংশ কর্তা বা কর্তৃপক্ষেরই সে-দিকটা যেন একেবারে পাষাণ হইয়া গিয়াছে।[৫২]

ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' (১৯০৬) উপন্যাসেও আমরা অনুরূপ চিত্র প্রত্যক্ষ করি। গোর্কি নজরুলকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। নজরুলের অভিমত অনুযায়ী 'গোর্কির পরে যে সব কবি-লেখক এসেছেন, তাঁদের নিয়ে বিশ্বের গৌরব করবার কিছু আছে কিনা তা আজও বলা দুষ্কর।[৫৩] ধর্মঘটের স্বপক্ষে নজরুল ও গোর্কির ভাবনা অভিন্ন—

> এতদিন নির্বিচারে মৌন থাকিয়া মাথা পাতিয়া সমস্ত অত্যাচার অবিচার সহিয়া-সহিয়া শেষে যখন আজ রক্ত মাংসের শরীরে তাহা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাহারাও মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। এই ব্যুরোক্র্যাসি বা আমলাতন্ত্র-শাসিত দেশেও তাহারা যখন তাহাদের দুঃখ-কষ্ট জর্জরিত ছিন্নভিন্ন অন্তরের এমন বিদ্রোহ-ধ্বজা তুলিল, তখন যাঁহার অন্তঃকরণ বা Sentiment বলিয়া জিনিস আছে, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, ইহাদের দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ কত বেশি অসহনীয় তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।[৫৪]

১৯২৫ সালের ১৬ই ডিসেম্বর শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসেবে *লাঙল* আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় দলের গঠনপ্রণালী, কর্মনীতি, সংকল্প এবং চরম দাবী। এই দলের উদ্দেশ্য ও উপায় নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ্যলাভ। পত্রিকার পরিচালক এবং দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন নজরুল। উল্লেখ্য, ১৯২৫ সালের শেষ দিক থেকে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন এবং নিজেকে কৃষক ও জেলেদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেন। তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। 'ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টি' (The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress) বা 'শ্রমিক প্রজা স্বরাজ দলে'র ছিলেন অন্যতম সংগঠক। এই দলের প্রথম ইশতেহার তাঁর স্বাক্ষর বহন করে প্রকাশিত হয়। *লাঙল* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় মুদ্রিত হয় নজরুলের 'সাম্যবাদী' কবিতা, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'কৃষাণের গান' এবং তৃতীয় সংখ্যায়

'সব্যসাচী'। পত্রিকা সূচিত হয়েছিল চণ্ডীদাসের অমর বাণী নিয়ে 'শুনহ মানুষ ভাই-সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' পরবর্তীকালে গ্রথিত হয় রবীন্দ্রনাথের আশীর্বচন 'জাগো, জাগো বলরাম, ধরো তব মরু-ভাঙ্গা হল, প্রাণ দাও, শক্তি দাও, স্তব্ধ করো ব্যর্থ কোলাহল।' *লাঙল* তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশের সময় থেকে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ শ্রমিক-পজা-স্বরাজ দলের সঙ্গে যুক্ত হন।

১৯২৬ াসলের ১৭ ও ১৮ই জানুয়ারি ময়মনসিংহ কৃষক শ্রমিক সম্মেলনে নজরুল অসুস্থতাবশত উপস্থিত হতে পারেন নি এবং এখানে তিনি একটি পত্র প্রেরণ করেন। সম্মেলনে পঠিত এই পত্রে তিনি কৃষক ও শ্রমিক ভাইদের উদ্দেশে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ—

> আপনারাই দেশের প্রাণ, দেশের আশা, দেশের ভবিষ্যৎ! মাটির মায়ায় আপনাদের হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর। মাটির খাঁটি ছেলে আপনারাই। রৌদ্রে পুড়িয়া বৃষ্টির জলে ভিজিয়া—দিন নাই রাত নাই-সৃষ্টির প্রথম দিন হইতে আপনারাই ত এই মাটির পৃথিবীকে প্রিয় সন্তানের মত লালন পালন করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন। আপনাদের মাঠের এক কোদাল মাটি লাইলে আপনারা আততায়ীর হয় শির নেন কিম্বা তাকে শির দেন, -এত ভালবাসায় ভেজা যাদের মাটি, এত বুকের খুনে উর্বর যে শস্যশ্যামল মাঠ,-আপনারা আমার কৃষাণ ভাইরা ছাড়া অন্য অধিকারী কেহ নাই। আমার এই কৃষাণ ভাইদের ডাকে বর্ষায় আকাশ ভরিয়া বাদল নামে, তাদের বুকের স্নেহধারার মতই মাঠ-ঘাট পানিতে বন্যায় সয়লাব হইয়া যায়, আমার এই কৃষাণ ভাইদের আদর সোহাগে মাঠ-ঘাট ফুলে-ফলে ফফলে শ্যাম-সবুজ হইয়া ওঠে-আমার কৃষাণ ভাইদের বধূদের প্রার্থনায় কাঁচা ধান সোনার রঙে রাঙিয়া উঠে,—এই মাঠকে জিজ্ঞাসা কর, মাঠে ইহার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইবে,—এ মাঠ চাষার এ মাটি চাষার, এর ফুল-ফল কৃষক-বধূর।
>
> আর আমার শ্রকি ভাইরা, যাহারা আপনাদের বিন্দু বিন্দু রক্ত দান করিয়া হুজুরদের অট্টালিকা লালে লাল করিয়া তুলিতেছে, যাহাদের অস্থি মজ্জা ছাঁচে ঢালিয়া রৌপ্যমুদ্রা তৈরী হইতেছে, যাহাদের চোখের জল সাগরে পড়িয়া মুক্তা মাণিক ফলাইতেছে, তাহারা আজ অবহেলিত, নিষ্পেষিত, বুভুক্ষু। তাহাদের শিক্ষা নাই, দীক্ষা নাই, ক্ষুধায় পেট পুরিয়া আহার পায় না; পরণে বস্ত্র নাই।[৬৬]

'ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির অন্তর্ভুক্ত মজুর স্বরাজ পার্টি' কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন হযে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল' বা 'The Workers; and Peasants' Party of Bangal' গঠন করে। এই কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র হিসেবে ১২ই আগষ্ট, ১৯২৬-এ আত্মপ্রকাশ করে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সম্পাদিত *গণবাণী*, *লাঙল* পত্রিকা যার সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। *লাঙল* ষোড়শ সংখ্যা পর্যন্ত নজরুলের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়েছিল (১৫.৪.১৯২৬)। গণবাণীর সঙ্গেও নজরুলের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। তিনি 'বঙ্গীয় কৃষক-শ্রমিক দলের' কার্যনির্বাহক কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ এই নতুন দল সম্পর্কে লিখেছিলেন—

একটা নূতন রাষ্ট্রনৈতিক দল গঠন করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই দল জনগণের দল। আমরা এর নাম দিয়েছি 'কৃষক ও শ্রমিক দল'। শোষণের কল্যাণে যারা সর্ব সম্পত্তি হারিয়ে আপনাদের পরিশ্রম ধনিকদের নিকটে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে শুধু যে সেই সর্বহারারা এই দলে থাকবে তা নয়, কৃষকরা ও নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা এতে থাকবে।[৫৬]

নজরুলের ভাষ্য—

এ কৃষক-শ্রমিক দলটা তুলসী বাবুর, নলিনীবাবুর মত গঠিত নেতার দ্বারা গঠিক নয়। গঠন করলে কারা, না, যত সব বিভিন্ন জেলার সত্যিকারের মজুর, ক্ষয়কেশো হাড়-চামড়া বের করা, আধ-ন্যাংটা বেগুন সিদ্ধ মত মুখ ওয়ালা চাষা-মজুর। আর তাদের নেতাগুলোও তদ্রুপ-না আছে চাল না আছে চুলো। তাতে বলশেভিক ষড়যন্ত্রের আসামি সব।[৫৭]

১৯২৬ সালের ২০শে আগষ্ট সংখ্যা *আত্মশক্তি* পত্রিকার পুস্তক-পরিচয় বিভাগে শ্রীতারানাথ রায় 'তারা-রা' নামে *গণবাণী*- র সমালোচনা করেন। উপরিউক্ত বক্তব্য প্রতিবাদস্বরূপ নজরুল কর্তৃক লিখিত পত্রের অংশ বিশেষ কৃষক শ্রমিক কর্তৃক *গণবাণী*- র বক্তব্য অনুধাবনের সামর্থ্য সম্পর্কে সমালোচকের যে প্রশ্ন ছিল তার উত্তরে নজরুল আরও লিখেছিলেন—

কার্ল মার্ক্সের মতবাদ সাধারণ শ্রমিক বুঝতে না পারলেও তা দিয়ে তাদের মঙ্গল সাধিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এ মতবাদ দিয়ে এমন কতকগুলি লোকের সৃষ্টি হয়েছে যারা জগৎটাকে উল্টে দিয়ে নতুন করে গড়তে চাচ্ছেন বা গড়ছেন। মতবাদ কোনকালেই জনসাধারণ বুঝবে না, মতবাদ তৈরি করে তুলবে সেই রকম লোক যারা বুঝোবেন এ মতবাদের মর্ম জনসাধারণকে। ইঞ্জিন চালাবে ড্রাইভার কিন্তু গাড়িতে চড়বে সর্বসাধারণ। 'গণবাণী'ও কৃষক শ্রমিকের পড়ার জন্য নয়, কৃষক শ্রমিকদের গড়ে তুলবেন যাঁরা—"গণবাণী" তাঁদেরই জন্য। কৃষক-শ্রমিক দলের মুখপত্র, মানে তাদের বেদনাতুর মূক মুখের বাণী "গণবাণী", তাদের বইতে না পারা ব্যথা কথায় ফুটিয়ে তুলবে "গণবাণী"।[৫৮]

উল্লেখ্য, কৃষ্ণনগরে চাঁদ সড়ক এলাকায় বসবাসকালে নজরুল হেমন্তকুমার সরকারের সহযোগিতায় একটি 'শ্রমজীবী নৈশ বিদ্যালয়' স্থাপন করেছিলেন। তিনি যথার্থই অনুধাবন করেছিলেন শুধু স্বরাজ চাইলেই চলবে না, দেশের মূল সমস্যা সমাধানে দৃকপাত করতে হবে।

বেগুন তিন আনা সের এবং মাছ কেন দেড় টাকা সের হয়, তাই লোকে জিজ্ঞাসা করে। যে ক্ষেত্রের মালিক বা মাছ ধরে, তার অবস্থা দিন দিন খারাপই হচ্ছে—জমিদার, মহাজন, দালালের গোটেই লাভের বার আনা যাচ্ছে। কাজেই ক্রেতাকে দাম এত বেশি দিতে হচ্ছে।

জমিতে চাষীর স্বত্ব নাই। যত্নের অভাবে ভূমির উৎপাদিকা-শক্তি নষ্ট হয়েছে। উৎপণ্ন প্রজার লাভের পূর্ণ অংশ নাই। আমরা গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছি।[৫৯]

শুধু পলিটিক্যাল তুবড়িবাজিতে তাঁর আস্থা ছিল না। সৈনিক নজরুল সংঘবদ্ধতার মূল্য জেনেছিলেন।

কৃষক ও শ্রমিককে সংঘবদ্ধ না করে, তাদের প্রয়োজনে তাদের অধিকারে জনগণকে সচেতন না করে আর আমাদের লম্বা লম্বা কথা কওয়া উচিত নয়।[৬০]

যৌবন ও তারুণ্যদীপ্ত নজরুল এই সংঘবদ্ধ শক্তির নেতৃত্বপদে অভিষিক্ত করেছেন দেশের তরুণ সমাজকে। কোন প্রকার শূন্যতা, ক্লান্তি, অবক্ষয় বা বিতৃষ্ণার দর্শনে নয়, প্রতিবাদে-বিদ্রোহে-বিপ্লবে-সংগ্রামে উজ্জীবিত করে তাদের তিনি দেশ—সমাজ-জাতি ও মানবতার জন্য দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

ক. আমাদের সম্মুখে কত প্রশ্ন, কত সমস্যা তাহার উত্তর দিতে পারে তরুণ, সমাধান করিতে পারে তরুণ। সে বলিষ্ঠ মন ও বহু আছে একা তরুণের। সম্মুখে আমাদের পর্বত-প্রমাণ বাধা, নিরাশার মরুভূমি, বিধি-নিষেধের দুস্তর পাথার; এই সব লংঘন করিয়া অতিক্রম করিয়া যাইবার দুঃসাহাসিকতা যাহাদের—তাহারা তরুণ।[৬১]

খ. আজ এই শব—সাধনায় তরুণ বাংলার ডাক পড়েছে-এস ভাই, তোমাদের মরণজয়ী পণ আর একবার শক্তিপীঠ বাংলাকে পবিত্র করুক। নেতাদের স্তোকবাক্যে ভুলো না—তোমাদের কাঁধে চড়ে যাঁরা নিজেদের উঁচু দেখান, সিন্দাবাদের নাবিকের সেই বোঝা ফেলে দাও! তুবড়িবাজি দেখে মুগ্ধ হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থেকো না—তোমার দুর্গম অমানিশার পথে ঐ আলো কেবল চোখে ধাঁধা জাগায়।[৬২]

নজরুল কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে একাত্ম হননি। গান্ধীর প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধা সত্ত্বেও অহিংসার মন্ত্রে তাঁর আস্থা ছিল না। বরং নৈরাজ্যবাদীদের মত বিপ্লব ও ভাঙনের মরণমন্ত্র বারংবার তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রতি ভালবাসা সত্ত্বেও খেলাফত আন্দোলনে তিনি নিজেকে যুক্ত করেননি। আবার, কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী এবং কৃষক শ্রমিক সংগঠনে সম্পৃক্ত থেকেও হননি কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। লীগ-কংগ্রেস কোন দলের সঙ্গেই তাঁর সংস্রব ছিল না। কবি হিসেবে তীব্র ও গভীর সংবেদনশীলতা এবং মানুষ হিসেবে উদার, অসাম্প্রদায়িক, বিবেকী দৃষ্টিকোণের অধিকারী হওয়ায় তিনি শোষিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত মানবতার পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। সুনির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক দর্শন তিনি জনগণকে দিতে পারেন নি সত্য, অনেকক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি আবেগপ্লাবিত হয়েছে, কিন্তু দেশ, জাতি ও বৃহত্তর মানবসম্প্রদায়ের কাছে, দায়বদ্ধতা, তিনি বিস্মৃত হননি। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে, প্রচলিত সমাজনীতির বিরুদ্ধে, তথাকথিত ধর্মব্যসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চিন্তাচেতনার জন্য তিনি সরকারী নিপীড়ন, স্বসমাজ ও প্রতিবেশী সমাজের প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছেন, কিন্তু মুক্ত ও স্বচ্ছ চিন্তার প্রগতিবাদীরা তাঁকে করেছে নন্দিত।।

তথ্যনির্দেশ

১ নবযুগ, *যুগবাণী, নজরুল রচনাবলী,* আবদুল কাদির সম্পাদিত, প্রথম খণ্ড, নতুন সং, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৮০৯

২ ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ, ঐ, পৃ. ৮১৪
৩ মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ী কে? ঐ, পৃ. ৮১৯
৪ আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন? , ঐ, পৃ. ৮৩৩-৩৪
৫ তুর্‌ড়ী বাঁশির ডাক, *দুর্দিনের যাত্রী*, ঐ, পৃ. ৮৫৬
৬ আমি সৈনিক, ঐ, পৃ -৮৬৩
৭ মোরা সবাই স্বাধীন মোরা সবাই রাজা, ঐ, পৃ. ৮৫৮
৮ আমার পথ, *রুদ্র-মঙ্গল*, ঐ, পৃ. ৮৭৯
৯ 'ধূমকেতু'র পথ, ঐ, পৃ. ৮৬৭
১০ দ্র. *কালান্তর*, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুন-মু, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৯৫, পৃ. ৫৪-৮৩
১১ *কাজী নজরুল ইসলাম: স্মৃতিকথা*, মুজফ্‌ফর আহমদ, দ্বি-প্র, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ. ২৪৫
১২ বিষ-বাণী, *রুদ্র-মঙ্গল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭৩
১৩ নজরুলের প্রবন্ধ: চেতনাপ্রবাহ ও শিল্পমান, সৈয়দ আকরম হোসেন, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য* প্রসঙ্গ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৭৭
১৪ ধূমকেতুর পথ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭৭
১৫ আমার পথ, *রুদ্র মঙ্গল*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭৯-৭১
১৬ ছুঁৎমার্গ, *যুগবাণী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২২
১৭ উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন. ঐ, পৃ. ৮২৫
১৮ বাঙালির ব্যবসাদারী, ঐ, পৃ. ৮৩৩
১৯ বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও, *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯
২০ তরুণের সাধনা,ঐ, পৃ. ৯৫
২১ ঐ, পৃ. ৯৬
২২ ঐ
২৩ ঐ
২৪ ঐ
২৫ ঐ, পৃ. ৯৮
২৬ আন্‌ওয়ার হোসেনকে লিখিত পত্র, ঐ, পৃ. ৩৭১
২৭ প্রিন্সিপাল ইব্রাহীম খাঁ-কে লিখিত পত্র, ঐ, পৃ. ৩৯৫
২৮ ঐ, পৃ. ৩৯৫-৯৬
২৯ ঐ, পৃ. ৩৯৮
৩০ ঐ
৩১ আজ চাই কি, ঐ, পৃ. ৩২
৩২ তরুণের সাধনা, ঐ, পৃ. ৯৫
৩৩ ঐ, পৃ. ৯২
৩৪ ইব্রাহীম খাঁ-কে লিখিত পত্র, ঐ, পৃ. ৩৯৫
৩৫ ঐ, পৃ. ৩৯৯
৩৬ মুসলিম সংস্কৃতির চর্চা, ঐ, পৃ. ১০৪
৩৭ ঐ, পৃ. ১০৫
৩৮ ঐ
৩৯ ঐ
৪০ ইব্রাহীম খাঁ-কে লিখত পত্র, ঐ, পৃ. ৪০০

৪১ ঐ
৪২ প্রতিভাষণ, ঐ, পৃ. ৯১
৪৩ ঐ
৪৪ ভূঁৎমার্গ, *যুগবাণী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২৩
৪৫ যদি আর বাঁশি না বাজে, *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ১২৭
৪৬ আমার লীগ কংগ্রেস, ঐ, পৃ. ৭১
৪৭ ঐ, পৃ. ৭১-৭২
৪৮ আল্লাহ্‌র পথে আত্মসমর্পণ, ঐ, পৃ. ১২১
৪৯ আমার লীগ কংগ্রেস, ঐ, পৃ. ৭১।
৫০ ইব্রাহীম খাঁ-কে লিখিত পত্র, ঐ, পৃ. ৩৯৯
৫১ স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ, ঐ, পৃ. ১১৪
৫২ ধর্মঘট, *যুগবাণী*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৬
৫৩ বর্তমান বিশ্ব-সাহিত্য, *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ২২
৫৪ ধর্মঘট, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৭
৫৫ কৃষক শ্রমিকের প্রতি সম্ভাষণ, ঐ, পৃ. ১২৮-২৯
৫৬ 'নূতন দল', *গণ-বাণী*, ১৪ এপ্রিল, ১৯২৭, উদ্ধৃত নজরুল-জীবনী, রফিকুল সলাম, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২, পৃ. ৩৭৬
৬৭ 'গণবানী' ও মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, *নজরুল রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ৫৩
৫৮ ঐ, পৃ. ৫৫
৫৯ "লাঙল", ঐ, পৃ. ৪৮
৬০ পোলিটিকাল তুবড়িবাজি, ঐ, পৃ. ৫০
৬১ তরুণের সাধনা, ঐ, পৃ. ৯৭
৬২ পোলিটিকাল তুবড়িবাজি, ঐ, পৃ. ৫১